Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইম্প্রেশনিজম ও বিষ্ণু দে-র কবিতা

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.5
Pages	57-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ইম্প্রেশনিজম ও বিষ্ণু দে-র কবিতা

বেগম আকতার কামাল

শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন ইজমের উদ্ভব ও পরিচর্যার পেছনে বহির্বাস্তরে ক্রমঘনায়মান সংকটাদির ছায়াপাত ছিল সক্রিয়। সমাজজীবনের সংকট–সমস্যাই শিল্পরূপের ক্ষেত্রে পরিবাহিত হয়েছে। বিশ শতকের সূচনা থেকে প্রায় তিরিশের দশক অবধি শিল্পকলা কতিপয় ইজমের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত বিপর্যয়কে প্রাতিস্বিক মাত্রায় ধারণ করেছে। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, অর্থনৈতিক মন্দায়, রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে এবং টেকনোলজির অতিদ্রুত স্ফীতির প্রেক্ষাপটে শিল্পের স্বাধিকার রক্ষার দায়বোধ জাগে শিল্পীর চৈতন্যে। ঐ সময়কালের আগে-পরে 'শিল্পের জন্য শিল্প 'এ-অভিধায় উক্ত স্বাধিকার রক্ষার প্রতিচ্ছায়ায় সিম্বলিজম, দাদাইজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফবিজম, সুররিয়েলিজম ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রীতিনীতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এসব ইজমের উদ্ভাবনায় উৎস হিসেবে প্রাথমিক ভিত রচনা করেছিল শিল্পকলার ক্ষেত্রে চর্চিত ইম্প্রেশনিজম ধারাটি। পরবর্তী সব ইজমের সূত্র ও আধুনিকত্বের সূচক হিসেবে এ ধারাটিকে চিহ্নিত করা চলে। কারণ, ইম্প্রেশনিজম সংজ্ঞার্থ ব্যাপকভাবে আঙ্গিকের নতুনত্ব-সম্পাদন ছাড়াও শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে-বৈপ্লবিক কিছু শর্তের বাহক ছিল। অঙ্কনরীতির ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভবের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরূপের জন্য আধুনিকতার অভিজ্ঞান-রচনা এ ইজমের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

এ আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা চলে ইম্প্রেশনিজমে বিধৃত দৃষ্টিশক্তির অবাধ ও মুক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি। দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে নতুনভাবে অবলোকন গড়ে তোলার নিহিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ মুক্তির উৎসারণ ঘটেছে— প্রথাপন্থীদের ব্যাকরণ অমান্য করে, শিল্পরূপের তথাকথিত ঔচিত্যবোধকে

পরিহার করে'। বাস্তবের অবিকল অনুকৃতি বাদ দিয়ে শিল্পীরা চাইলেন প্রাণের অনুরণণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনকে বাঙ্ময় করে তুলতে। এ-লক্ষ্যে শিল্পীরা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পরিণত করলেন এক বিশেষ মানসিক অবস্থার রূপে, যা হল একটি মাধ্যম। বাইরের চর্মচক্ষে দেখা বস্তুকে এ-মাধ্যম দিয়ে ভিন্ন এক জগতে প্রত্যক্ষণের বিষয়ের মধ্যে ধারণ করা হতে থাকে। বৃক্ষলতা, আকাশ-পৃথিবী, রঙ-রেখা-আলোর বিন্যাসে দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু এখানে হয়ে ওঠে কখনও শিহরণ, কখনও শব্দহীন সঞ্চরণ, স্বাদগন্ধময়, কখনও-বা একটি দ্যুতি। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুকে এক অতিজাগতিক অনুভূতির বলয়ে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই এর অভিপ্রায় এবং এ-উত্তরণে গভীরতর অন্তর্জীবনের স্পন্দনই সদাসঞ্চরণশীল এক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এটাকে বলা চলে আত্মগত দৃষ্টিশক্তির স্বয়ম্ভর প্রকাশ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটান যেসব শিল্পী তাঁদের মূলকথাই হলো 'আলোক'। মানে, দেগা রেনোয়া প্রমুখ শিল্পীর তীক্ষ্ণ ঈক্ষণ ও আলোক সম্পর্কিত ধ্যানধারণাকে অনুসরণ করে অনুভূতির স্পন্দনে প্রাণময় বস্তুসত্তাকে রঙের বিচিত্র প্রয়োগ-ভাবনায় নিয়ে গেলেন সেজান, স্টুয়ার্ট, ভ্যানগগ, পল গগা প্রমুখ। এঁদের হাতে শিল্পকলা প্রচলিত সংস্কার, ঐতিহ্যিক উপাদানের আধিপত্য আর রিয়েলিজমের সামাজিক অলঙ্কৃতির আনুগত্য থেকে মুক্ত হল।

ইম্প্রেশনিজম যদিও শিল্পকলারই কাব্যিক ভাষা, তবু কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে এর একটি সুগভীর অন্বয় সাধিত হল। বিশেষত, কবিকে একজন অনুভূতিশীল জগৎপর্যবেক্ষণকারী দ্রষ্টার ভূমিকায় স্বাধীনভাবে দাঁড়ানোর শক্তি যোগাল ইম্প্রেশনিজম। একই বস্তু বা দৃশ্য বা তথ্যকে বিচিত্র মাত্রায় সঞ্চরণশীল করা বা পৃথিবীর আপাত দৃশ্যমান বস্তুসমূহ এক নবতর অবলোকন ক্ষমতায় ধারণ করার ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেন। আর এই পর্যবেক্ষণের বা অবলোকনের ভিতে যেহেতু থাকে কবির যন্ত্রণাজটিল হৃদয়ের গভীর দ্বন্দ্ব, আঘাত-বেদনা ও দার্শনিকতার বিভা, সেহেতু একভাবে তিনি সত্তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি আবিষ্কারেই এ রীতির প্রয়োগ ঘটান। অর্থাৎ এটা বোধ-ক্রিয়ারই নব্যরূপান্তর— দৃশ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের প্রথাবদ্ধ ও প্রাত্যহিক অবলোকনকে ভেঙে-গড়া ও তাকে নতুন ধীশক্তি দান করা।

অবশ্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে রঙের সূক্ষ্ম বিভাজনে অনুভূতির বাঙ্ময় রূপ যত অনায়াসে সৃষ্টি করা যেত, যত সহজে এখানে যে কোন দৃশ্যবস্তুর পুনরুজ্জীবনের মধ্যে প্রাণের অনুরণনকে ধরা যেত, কবিতার ক্ষেত্রে সেটি ততো সহজ ব্যাপার ছিল না। আলো ও রঙের মাধ্যমে বস্তুর মুখশ্রী পরিবর্তনের তাৎপর্যই শিল্পকলার

মুখ্য প্রকরণ। কিন্তু কবিতায় ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি প্রথমেই আশ্রয় করেন তাঁর অতিসূক্ষ্ম ঈক্ষণকে। এ ঠিক তথাকথিত ব্যক্তিশরীরের চক্ষুরেন্দ্রিয় নয়, এ ঈক্ষণশক্তিতে সংগুপ্ত থাকে মানবহৃদয়ের সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবাহের কম্পনতরঙ্গ। শারীরিকতা বা দৃষ্টজগতের অনপেক্ষ চলমানতা থেকে এ কম্পন মুক্ত থাকে, ব্যক্তিসত্তার চেতন ও অবচেতনলোকের রহস্যময় সংযোগবিন্দুর সূত্র থেকে উক্ত কম্পন সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি তার সত্তায় যা অনুভব করে, তারই সংবেদনকে বহির্জগতের রূপে ব্যক্ত করে। এ হচ্ছে অন্তর্জগতে দাঁড়িয়ে বহির্বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা। এ-সূত্রেই লক্ষ করা যায়, যে ইম্প্রেশনিজমের ক্রোড়েই বেড়ে উঠেছে পরবর্তী সকল ইজমের পরম্পরা যেখানে ব্যক্তির অন্তর্বিশ্ব বহির্জগতের রূপে প্রাতিস্বিকতা অর্জনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তিময়তার এই তদ্‌গত-ভাবনাই শিল্পের অবয়বে নৈর্ব্যক্তিকতা লাভের বিপরীত সাধনা করেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এ-তাৎপর্যেই বিবর্ধিত হয়েছে সুররিয়েলিজম এবং তাঁর সত্তার মুখচ্ছবি।

যেহেতু চলমান ও স্পন্দনশীল দৃশ্যজগতের প্রস্ফুটনই ইম্প্রেশনিস্টিক পদ্ধতির অভীষ্ট, তাই কবিকে এক্ষেত্রে হতে হয় গভীর অন্তর্দৃষ্টিগুণসম্পন্ন এবং অভ্যন্তরমুখী। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিময় ঈক্ষণ আলোকের মাধ্যমকে সর্বদাই সচলতায় অনুসরণ করে। আমরা আলো দিয়ে বস্তুকে দেখি, আলোকের মাধ্যমেই বস্তুর আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, বস্তুর সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়। বস্তুর ভেতরেও আলোই সর্বদা পরিবাহিত হচ্ছে এবং বস্তুকে নিরন্তর স্পন্দ্যমান করে রাখছে। জীবনানন্দ আলোককে নানাবর্ণে ও স্পন্দনে, রেখার বিন্যাসে ও অবয়বঘনত্বে ব্যবহার করেন। আলোক কখনও-বা তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে একটি ব্যক্তিসত্তা। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

ক　দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা

চোখের– দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির; (মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

খ　কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়

পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা; (ঘাস, বনলতা সেন)

গ　আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল; (শিকার, বনলতা সেন)

ঘ　সোনালিআগুন

চুপে জলের শরীরে

নড়িতেছে— জ্বলিতেছে— মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্বলে যায়— দহে নাক' কিছু। (একটি কবিতা, সাতটি তারার তিমির)

আলোক এখানে দৃশ্যাঙ্গ নয়, আলোকই বর্ণনীয় বিষয়সত্তা, অনুভূতি ও দৃশ্যের বর্ণান্তর আলোকসত্তা দিয়েই অবয়ব পাচ্ছে। অনুভব-প্রকাশের তীক্ষ্ণ গভীর অন্তর্দেশকে জীবনানন্দ আলোকের তরঙ্গস্পন্দনে দোলায়িত করেন। আর নিসর্গজগৎ তো জীবনানন্দের কবিতায় আলোরই বহুমাত্রিকতা।

ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিনীতির এক জাতীয় প্রভাব বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তবে এ-প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী আবেগ-উৎস থেকে জাত নয়, এর পাশ্চাতে কবির মনোজগৎ ও প্রকরণকলার দ্বন্দ্বময় প্রকাশরূপের তাড়না কাজ করেছে। মূলগত অর্থে বিষ্ণু দে ধ্বনিময়তার ওপর নির্ভরশীল, যা মহৎকবিতা মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিষ্ণু দে যখন বিশেষভাবে দৃষ্টিনির্ভর হন, তখন কবিতায় রং ও আলোর একটা সচিন্ত্য বিন্যাসক্রম গ্রহণ করেন। এ-গ্রহণেরক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে তাঁর তীক্ষ্ণ ঈক্ষণের সঙ্গে বোধক্রিয়ার মার্জিত একটি অনুভব-মাত্রা। যখন তিনি ইন্দ্রিয়ানুভবকে তাঁর বস্তুময়ভাবনার অতিরিক্ত মাত্রায় ধারণ করতে চেয়েছেন তখনই বোধশক্তির সঙ্গে ঈক্ষণের পরিচর্যা প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতা রচনার প্রাথমিক পর্যায়েই তাঁর অবশ্য একটি লক্ষ্য ছিল বোধিন্দ্রিয়ের মানবিকীকরণ। *উর্বশী ও আর্টেমিস* (১৯৩২) কাব্যে তাই রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পৌনঃপুনিক পরিচর্যা, রয়েছে প্রচল রোমান্টিক বৃত্তিশাসিত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও মেধার লাবণ্য সঞ্চারের সংকল্প। এ-সংকল্পে তিনি চেয়েছেন সেই মানসিক অবস্থার সূচনা ঘটাতে, যার মধ্যস্থতায় বস্তুবিশ্বের বিরুদ্ধতা ও হৃদয়ভাবের একাকিত্ব— দুইকে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিরুদ্ধতার প্রেক্ষাপটে আত্মবাসনার উর্দ্বতনই কবির কাম্য। উক্ত কাব্যে তাঁর অঙ্কিত দৃশ্যে তাই ঝকঝকে বালুকাবেলা, স্ফটিকনীল আকাশ, সবুজ সমুদ্র, প্রখর রৌদ্রালোক, পাণ্ডুর লাবণ্যময় মুখচ্ছবি রয়েছে। রৌদ্রে ও সুবর্ণে মিশ্রিত নারীদেহের মূর্তরূপ গড়েন কবি সেই প্রকৃতিপটে যেখানে

নির্মেঘ পৌষের প্রখর রৌদ্রের
মুঠি মুঠি হীরক কণায়
অন্তহীন বেলাভূমি কেঁপে চলে যায়
উদাসীন রহস্যের শেষ কিনারায়। (সাগরউত্থিতা)

স্পেস বা স্থানিক পটকে কবি আলোকবিন্যাসেই দ্রবীভূত করে' আবার অনুভবের বলয়ে স্পন্দন দিয়ে নব আকার দান করেন। কবির দৃষ্টিশক্তি বিষয়ভাবনাকে আলোকের কাঠামোতেই ব্যঞ্জনা দেয় :

ক　কুমারীর ক্ষীণ দেহ বয়ে যায় সবুজ আলোতে।

খ　সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলোয়

গ　আকাঙ্ক্ষার আমার আকাশ করে দিলে নীল শরতের দিন
　　সূর্যাস্তের দীপ্তিতে রঙিন

ঘ　প্রভাতের আলো নামে স্নান শুভ্র কুমারীর মতো পাণ্ডু মুখে তার

ঙ　সূর্যাস্তের বর্ণস্রষ্টা ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায় স্পর্শধন্যতায়।

চ　তোমার সুঠাম দেহ গোধূলি-রঙিনতনুখানি

ছ　দেহে তব গোধূলির ছায়া
　　নিবু নিবু বাসনার আলো,

জ　রৌদ্রের হীরকচূর্ণ সর্বঅঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়

ঝ　অন্ধকার আকাশ সভায় নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যাও নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।

প্রকরণকৌশলের একটি পদ্ধতি হিসেবে বিষ্ণু দে কবিতায় পরিবাহিত করতে চেয়েছেন চিত্র ও ভাস্কর্যের মাত্রা। চিত্ররচনার প্রচল পথ বর্জন করে চিত্রকলা উপভোগের মধ্য দিয়ে যে নন্দনদৃষ্টি গঠন করা যেতে পারে, তারই সূত্র দিয়ে নির্মাণ করেন কবিতার প্রকরণ। এটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থেকে উদ্দীপ্তি পায় না, বরং কবির প্রতিভাদীপ্ত মনন ও বৈদগ্ধ্যের চাপ থেকেই এর উৎসারণ ঘটে। জীবনানন্দে অনুরূপ ক্ষেত্রটি তৈরি হয় ইন্দ্রিয়ময় বস্তুবিশ্বের যে কোন প্রাণী, জড় বা মুহূর্ত দ্বারা। বিষ্ণু দে-র দৃষ্টিলোকে রয়েছে মানবসভ্যতার শিল্পকলা-ভাস্কর্যের ঐতিহ্যের পশরা ও নান্দনিক বিশ্লেষণের আবেগ। *চোরাবালি* (১৯৩৬) কাব্যে বিষ্ণু দে প্রবলভাবে স্থাপত্য ও পৌরাণিক অনুষঙ্গের একটি স্থিরাবয়বে বোধকে সমর্পণ করেন। এ কাব্যে তাঁর রূপকল্পে রয়েছে একাধিক ইজমের প্রতি আগ্রহ-প্রদর্শন। অন্যদিকে তিনি এখানে তুলনামূলকভাবে নৈর্ব্যক্তিক বহিরাশ্রয় সন্ধানে উৎসুক বলে এর মধ্যে ইম্প্রেশনিস্টি রীতি একটি অত্যদ্ভুত মিশ্রণে সমাশ্রিত হয়েছে। কখনও কবি কিউবিজমের জ্যামিতিক অবয়বে, কখনও 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ'-এর বিন্যাসে উক্ত রীতিকে বিগলিত করেন। কেননা, *চোরাবালি*-তে বিষ্ণু দে আধুনিক রূপকল্পের বিচিত্র মাত্রায় বিচরণে অনেকবেশি উদ্বেজিত। কিছু উদাহরণ;

ক উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা,
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা (ওফেলিয়া, চোরাবালি)

খ সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে।
আকাশগঙ্গা পীতপিঙ্গল বালুকারেখা (যযাতি, ঐ)

গ বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্নগোধূলি ডুবে গেল হায় খররক্তের কোলাহলে। (ক্রেসিডা)

অনুভূতির সূক্ষ্মরূপ অবলোকনের পরিবর্তে কবি ক্রমেই আত্মসত্তার বহির্গমনকে বিধৃত করতে চেয়েছেন। ফলে প্রকাশগত ক্ষেত্রে প্রতীক, চিত্রকল্পের যাথার্থ্য সূচিত করতে হয়েছে অথবা টুকরো টুকরো বস্তুর সমাহারে বিন্যাসক্রম গড়তে হয়েছে। তবে কখনও কখনও তিনি দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবকে অন্তর্লীন মনোজগতের দিকে সঞ্চালিত করেন। বহির্বাস্তবকে এভাবে অন্তর্জীবনের গভীর স্পন্দনে ধ্বনিত করবার প্রয়াসে কবির আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় ইম্প্রেশনিষ্টিক পদ্ধতির পর্যবেক্ষণশীল অনুভব। ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টির আলোকেই বাস্তবের দৃশ্যবস্তু পুনঃসজ্জিত হয়। কারণ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাষ্য–সমবায়ে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় এক নতুন বাস্তবধর্মিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নিজের শিল্পিত, সত্তার নির্মাণ-সূত্রে তিনি বাস্তবকে প্রতিনির্মাণ করেন বলে এর অন্বেষণে তাঁর অবলম্বন-রূপে গৃহীত হয়েছে প্রকৃতিবিশ্ব। এবং প্রবল হয়েছে দৃক্‌শক্তির ব্যবহার।

উক্ত বাস্তবতার একমাত্রায় তিনি সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ার ভূদৃশ্যে দৃক্‌শক্তির প্রত্যর্পণ করেন। মধ্যবিত্ত এলিট বাঙালির জনবিচ্ছিন্নতা ও ঐতিহ্যছিন্নতার অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে-র লক্ষ্য ছিল জীবনের সর্বসংস্কৃতিগত সংগঠন বা ছকটিকে অনুধাবন করা। রিখিয়ার ভৌগোলিক রূপে এ ছককে যখন সন্ধান করেন তখন রং ও আলোর প্রয়োগ কবিতাকে অধিগত করে। অন্যথায় বিষ্ণু দে সর্বদাই ধ্বনিপ্রধান, ব্যাখ্যাময়, বিশ্লেষণাত্মক। কিন্তু যখন অভিজন ব্যক্তির জটিল মানস উত্তীর্ণ হতে চায় সাযুজ্যের পটে, তখনই তিনি নিজেকেও পরিস্ফুট করতে চান। অনুভবের দ্বার উন্মোচনে তখন তাঁর মনোযোগ বেড়ে যায়, চলমান জীবনছবির প্রকৃতিলগ্ন অবয়বে নিজের বোধকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে ইম্প্রেশনিস্টের মতো অনুভূতির রূপায়ণকে গ্রাহ্য করেন। নিছক চিত্রের স্থিরত্ব নয়, ইম্প্রেশনিজমে অভিজ্ঞতার নানার্থবাহী দৃশ্যাবলি সর্বদাই পরিবর্তনসাপেক্ষ। প্রেরণার সঙ্গে প্রেক্ষণকে স্বতঃস্ফূর্ততা দান করাই এখানে মূল লক্ষ্য। ফলে শিল্পী

বিপরীত রঙের বিরোধ থেকে গতিময়তা সৃষ্টি করেন। কবিতার শব্দসম্ভারে এ গতি তৈরি হতে পারে যদি একই সঙ্গে ছবির রেখা ও ছন্দের গতিকে ধারণ করা যায়। বিষ্ণু দে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষাপ্রবণ।

তবে কবি যখন দৃশ্যজগতের নিয়ত পরিবর্তমান মুখশ্রীকে তাঁর তত্ত্বের তথা মার্কসীয় দর্শনের দ্বান্দ্বিকগতির প্রতীকতায় বা চিত্রকল্পের তাৎপর্যে দাঁড় করান, তখন নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রাতস্বিকতা— এই দ্বৈততত্ত্বে শিল্পীর সত্তা বিলোড়িত হয়। দৃশ্যকে এক ঝলক দেখে নিয়ে একজন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী যেমন রং ও আলোর খেলায় মেতে ওঠেন, একটা আবেদন-সমগ্রতার ব্যঞ্জনা তৈরি করেন, সেখানে বিষ্ণু দে সামগ্রিক বোধটাকেই বিচ্ছুরিত করেন। বোধকে অনুভূতির ভেলায় চড়িয়ে তিনি চান অর্থের উপকূলে পৌঁছতে। রং আর রেখা সেখানে একটা বহিরাশ্রয় হিসেবেই প্রবিষ্ট হয় মাত্র। যেমন :

ক　ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
　　নিশ্চিহ্ন সবুজ লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
　　শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘনার
　　সরীসৃপ নীল। (সন্দ্বীপের চর, সন্দ্বীপের চর)

খ　শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
　　হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিকে দিনে হীরক সন্ধ্যায় (অনিষ্ট)

প্রথম দৃষ্টান্তে কবির ঘৃণার অনুভূতি ও আশার সংবেদ নীল ও লাল রঙের অন্তর্বয়ন ঘটিয়েছে। রঙের বিরোধকে ব্যবহার করে কবি দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বকে অনুভূতিগত করতে চান। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ঋতুক্রমায় রঙের আলিম্পনকে কবি তাঁর প্রত্যাশা ও বিশ্বদর্শনের রূপকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণু দে সর্বদাই কবিতায় বিষয়কে রং-রেখায় ও ধ্বনিময়তায় প্রতিস্থাপন করেন বলে ঐ বিষয়ঘনত্বেই বস্তুবিশ্বের চলমানতা কখনও স্থিরত্বে, কখনও চাঞ্চল্যে গতিময় হয় এবং রং–আলো বস্তুর আকৃতি মুছে দিয়ে ভাবনার অনুষঙ্গ তৈরি করে।

পূর্বলেখ (১৯৪১) কাব্য থেকেই তাঁর এই ভাবনার অনুষঙ্গময় নন্দনবিশ্ব তৈরির প্রয়াস চলেছে। কবির জন্য এ বিশ্বের উৎস যেমন বহুমাত্রিক, তেমনি তাঁর বিচরণও বহুবাদিতায় ঋদ্ধ। লোকায়ত প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে মননশীল সত্তাকে মেলাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর ইম্প্রেশনিস্টিক রীতি হয়ে ওঠে প্রতীকতার দ্বারা গ্রস্ত, কেননা ধারণার রূপায়ণই প্রতীকের কাজ আর ইম্প্রেশনিজমের লক্ষ্য

অনুভূতির রূপায়ণ। আবার যেহেতু উক্ত ধারণা বহুত্ব দ্বারা গ্রন্থিল, ফলে বিষ্ণু দে–কে চিত্রকল্পের ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বারেই যেতে হয়। এ কারণে এলিয়টীয় ইমেজিজমই তাঁর কবিতায় শেষ পর্যন্ত অব্যবহিত ও পারম্পরিক। কবির তত্ত্বভাষ্যের চিত্রকল্প যখন প্রকৃতিপটে প্রাণিত হয়, তখনই বিষ্ণু দে কবিতায় ছবি আঁকেন। *সন্দ্বীপের চর* (১৯৪৭) কাব্য থেকে এ জাতীয় পরিকল্পনার প্রবল প্রকাশ লক্ষণীয়। একটি বিশেষিকৃত বিন্যাস তৈরি করে তাতেই তিনি পুনঃপুনঃ এঁকে গেছেন তাঁর মনন ও শিল্প–অভিজ্ঞতার দ্বৈতত্ব। যথাযথ বক্তব্যের জন্য প্রতীক সন্ধান না-করে, বহিরাশ্রয় উপাদানের ঐশ্বর্যশালায় ভ্রমণ না করে সরাসরি রং ও রেখার দ্বারস্থ হয়েছেন। যেমন :

ক যেখানে খাড়াই শেষ দিগন্তের নীলে দূর শূন্যে,
হিরনার স্তনাগ্র শেষ আকাশের হঠাৎ আশ্লেষে,
ধানের সজল স্বচ্ছ সর্ষের অনচ্ছ আবেশে
মাটিতে কাঁকরে লাল আপিঙ্গল রেখায়,
সেইখানে চোখ চলে, (বারোমাস্যা, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

খ হৃদয়ে বনানী রসাল সবুজ লাল
শাল পিয়ালের পিপুলের সমারোহে, ...
শিকড়ে শিকড়ে প্রাণের গঙ্গা রাঙা
অথচ রাতের কোরকে সদ্য দিনগুলো ঝরে যায়। (ঐ)

গ কালো পাহাড়ের গায়ে চমকাল রেখা শাড়ির শাদায় কস্তাপাড়ের সিদুঁরে
কষ্টিতে ঋজু কোমল শরীরে তরল স্রোতের ছন্দ। (আলেখ্য, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)

ঘ পৃথিবী তাকেও স্নেহে দিয়েছিল রহস্যের চাবি
আপন আবেগ আর বিধিনিষেধের,
আশ্বিনের মেঘ তার তনুদেহে এঁকেছিল দাবি,
রৌদ্রে তার চোখদুটি গান করে নূতন বেদের। (লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা, ঐ)

এখানে ল্যান্ডস্কেপ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে কবির ভাবনাকে প্রতিস্থাপনের ব্যঞ্জনায়। পাঠকের শ্রুতিকে নয়, দর্শকের চোখকে কবিতার ভিতর নিয়ে যায়। সরল, সাধারণ দৃশ্যাবলিতে, চিরায়ত ঋতুর পটে তিনি ইঙ্গিতবহ করে তোলেন তাঁর দ্ব্যর্থক–বক্তব্য। ইম্প্রেশনিজমেও দ্বৈত-মনোভাব থেকে দ্ব্যর্থক ভাবনার উৎসারণ ঘটেছিল। বিষ্ণু দে দ্বান্দ্বিক ভাবনার পটেই দ্ব্যর্থকতার কৌশল রচনা করেন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী একদিকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণস্বভাবকে রূপের বশবর্তী করেন,

আবার অন্যদিকে একধরনের অধীরতা ও উদ্বেগ দ্বারা মানসিকভাবে পর্যাকুল হয়ে থাকেন। অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের অসমঞ্জসবোধ থেকেই জাত অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ তাঁকে আবৃত করে রাখে। বিষ্ণু দে-ও তাঁর বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্য-রচনার সূত্রে সর্বদাই অস্থির ও অশান্ত, আবার তাঁর তত্ত্বের মূল দর্শনটাই হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার চিরায়ত পটে বিচরণ করা। এক্ষেত্রে চলমান, চোখে দেখা জগৎকে বা জীবনের ছন্দকে প্রস্ফুটনের ক্ষেত্রে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর মতোই দ্বৈত-মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। ফলে তাঁর কবিতায় যখন দৃশ্যচছবি অঙ্কিত হয় তখন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর মতোই অনুভবকে স্পেসের স্বাধীন গঠনে বিভান্বিত করেন। তাৎক্ষণিকের সীমায়ত পরিমণ্ডল থেকে এসব দৃশ্যের 'স্পেস' সর্বদাই বক্তব্যের বিস্তারকে অসীমত্বের দিকে বাহিত করে। রিখিয়ার ভূদৃশ্য বা জীবননকশা হয়ে ওঠে কাঙ্ক্ষিত জীবনরূপের প্রাণস্পন্দন। চিরায়ত নদী, সমুদ্র, আকাশ, ঋতুর পরম্পরা হয়ে ওঠে ভাবের সূক্ষ্মব্যঞ্জনা, যদিও এসব উপাদান যতোটা ইঙ্গিতমুখ্য, ততোটা ইঙ্গিতমুখর নয়।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে বিষ্ণু দে-র ছবি আঁকার তথ্য। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি বেশ কিছু ছবি এঁকেছেন। চিত্রকর হিসেবে এ পরিচর্যার অন্তরালে কোনরকম প্রথাসিদ্ধ অনুশীলন নেই, অভ্যাসের দায় থেকেও এ মুক্ত এবং নৈপুণ্য সাধনার ব্রতও অনুপস্থিত। কবিসত্তার নান্দনিক সৃজনক্ষমতর ভিন্ন-আঙ্গিকে উৎসারণই এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। এসব অঙ্কিত দৃশ্যে তাঁর মগ্নচেতনার ছায়াচ্ছন্ন প্রকাশ রয়েছে, আর রয়েছে নিবিড় অন্তর্মুখিতা। ছবিগুলোর মুখ্য বিষয় হচ্ছে পথ। দূরান্তরের প্রসারিত ঘনতায় আবৃত হয়ে পথ কবির মননশীল চেতনার প্রতীকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

তিনি যখন কবিতায় ছবির পর ছবি শব্দের মধ্যে মূর্ত করেন তখন ছবির অঙ্কনরীতির পদ্ধতি অন্তর্গৃহীত হয়। অসমতার পরিমণ্ডলে বিকেন্দিক স্থানকে স্পেসের তাৎপর্যে ধারণ করেন— রিখিয়া অঞ্চল হয়ে ওঠে কলকাতায় অসমতার ভিতে একটি বিকেন্দ্রিক স্পেস। এ স্পেস কবির অভিজ্ঞান ও অনুভবকে যৌথভাবে ধারণ করে। আবার যেহেতু দ্বান্দ্বিকতাই তাঁর গঠনশৈলীর মধ্যে ব্যঞ্জনার্থক হয়ে ওঠে, সে-লক্ষ্যে বিষ্ণু দে প্রয়োগ করেন অস্থির একটি আবর্তময় পরিমণ্ডল। একটি দৃশ্য প্রতীক বা চিত্রকল্পের বীজ থেকে মুকুলিত হয়ে উক্ত অস্থিরতা স্পূর্ণ কাঠামোতে নৃত্যময় হয়। একটি পুরো কবিতার দৃষ্টান্তে তাঁর এই ছবি ও গতির দ্বৈতত্বে অভিজ্ঞানের সঞ্চালন-ক্রিয়াটিকে লক্ষ করা যেতে পারে। *স্মৃতিসত্তাভবিষ্যত* (১৩৭০) কাব্যের 'প্রবীণ সারস' নামধেয় কবিতাটি :

যেখানে পাহাড় বেঁকে নেমে গেছে নদীর বালিতে
সেইখানে, হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে দেখা হল,
একা, নিষ্পলক তাকালুম, চেনাঅচেনায় মেশা,
বনের ঢালুতে হঠাৎ সামনে দেখা,
মুখে কথা নেই, ভাবা-না ভাবায়
নিস্তব্ধতা কুলুকুলু করে,
কথা কি সে বলেছিল?
বলেছিল : প্রিয়তম, চিত্ত মম জীবনমৃত্যুর
প্রতি মুহূর্তের সূত্রে গেঁথেছিল পরাণবঁধুর
যে বাহুবন্ধন, তাই দিয়ে যাই তোমার বিস্ময়ে,
মোরে তুমি বেঁধে নাও নীরব নির্জন বরাভয়ে।
নাকি সে বলেনি কিছু?
আমারই হৃদয় নগ্নতায় মাথা নিচু ক'রে
হঠাৎ দাঁড়াল মুখোমুখি
মহাসুখী, জীবনমৃত্যুর বিবিক্ত উল্লাসে রভসে অবশ?
মুহূর্তের সূত্রে বাঁধা স্মৃতি আর স্বপ্নের পাহাড়ে ঘেরা পাড়ে
বালিচরে ঘাসের আভাসে নাচে একা এক
শুভ্রকেশ প্রবীণ সারস।।

'প্রবীণ সারস' কবির অভিজ্ঞানের ইমেজ, প্রকৃতির চিরায়ত পটে এর অবিনশ্বর নৃত্য। মুহূর্তের স্মৃতি আর স্বপ্নের উল্লাসে এর ঘাসময় বিচরণ প্রাণস্পন্দনের তালকে ধরে রাখে। দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কবি প্রকৃতির নির্জন বরাভয়ে বাঁধেন, শুভ্রকেশ সারসের প্রবীণ দ্রষ্টার মৌনতায় তাঁর আশ্বাস মহাসুখী হয়ে ওঠে। এখানে কবির চোখ প্রত্যক্ষ করে স্তব্ধতার পটে তাঁর দ্বন্দ্বময় নৃত্যকে। ফলে একই গতির মধ্যে দোলায়িত হয় ছবির স্পেস আর ছন্দের স্পন্দন — যেখানে জীবনের পটপ্রেক্ষা ও গতিময়তা মূর্ত হয়। কবি শেষদিকে কলকাতার নাগরিক জীবনছবির খণ্ডবিখণ্ড রূপ পরিহার করে প্রকৃতির বর্ণসমারোহ, নীল-শ্যামল মৃত্তিকা, পাহাড়ের শক্তি অন্বেষণ করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে রিখিয়াই হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাসের দ্বিতীয় আবাসভূমি। চাষবাসের ছবি, বন্যজীবনের বলিষ্ঠ আদিম জীবনরূপ, টিলাপ্রান্তের গ্রাম ও পথ কবির দৃষ্টিশক্তির অনেক কাছে চলে আসে। ক্রমে কবি আশাবাদী চিত্তকে সমর্পণ করেন চাষীর সৃজনশীল কাজে, 'নিসর্গের উচ্চাবচ সংহতি-তরঙ্গে', কথনওবা 'প্রকৃতির শান্ত হর্ষে' তাঁর বেঁচে থাকার অনুভব ও তাৎপর্য চিত্রিত হয়। জীবজগতের প্রবল প্রাণের

জয়কীর্তনই বিষ্ণু দে-র কবিতায় শেষাবধি ধ্বনিত; প্রকৃতির হর্ষে-সজীবতায়-স্পন্দনে কবি তাঁর হৃদয়স্পন্দনকে সমর্পণ করেন :

> আজ দেখি সে-গাছ— হাজারখানেক তালশার্স--
> হার-না-মানা হার পরেছে সে তার চূড়ায়।
> রোজ কত পাড়ে— তবু যে অফুরন্ত।
> চোখের আরাম— কচি সবুজ নিটোল কোমল শীতল, সে তালশাঁস।
> -মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও হে শূন্যে, ওড়াও, হে প্রবল প্রাণ।
> (আমার চেনা গাছ কটি, আমার হৃদয়ে বাঁচো)

যদিও এ অন্তর্গঠনকে বলা যাবে না ইম্প্রেশনিজমের প্রয়োগফল, তবু নেপথ্যে কবির চেতন ও অনুভূতির দ্বৈতস্তর একটি সংযোগবিন্দুর মধ্যে মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। এ উদ্বেলতায় রয়েছে অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চালন। বিষ্ণু দে তত্ত্বভাষ্য ছাড়িয়ে মনন-অতিরিক্ত একটি মূর্ত, স্পন্দনশীল ইন্দ্রিয়জগতের হর্ষ দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছেন। তবে সর্বদাই প্রয়োগগত কৌশলরূপে উক্ত ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিকে কবি ব্যবহার করেছেন, ফলে এটা হয়েছে একটি আংশিক প্রণোদনা। কিন্তু নিহিত আবেদনে এর তাৎপর্য অবশ্যই সুগভীর।

তবে এ রীতির মূল দর্শনটাই তাঁর চিত্তবিরোধী। ইম্প্রেশনিজম ইন্দ্রিয়ময়তার ভিত্তিতে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রদর্শন করে বলে এখানে বুদ্ধিবৃত্তি থাকে নেপথ্যে, কখনও-বা বিরোধমূলক অবস্থানে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্দৃষ্টির চূড়ান্ত পরিকর্ষণ একে শেষ পর্যন্ত প্রাতিস্বিকতার বলয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। তত্ত্ব বা আদর্শ নয়, বাস্তবের স্থূল উপাদান বর্জন করে এ শুধুই বস্তুর কোমল লাবণ্যটুকু ছেঁকে নিতে চায়। বিষ্ণু দে বুদ্ধিবাদে আশ্রিত, বাস্তবতার সর্ববিধ উপাদানের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক-ভাবনায় সংযুক্ত, তাঁর কাছে তত্ত্বই হয়ে ওঠে কাব্যিক সত্য। হৃদয়স্থ অন্যান্য গভীরতাকে তিনি ঋদ্ধ করেন মনন ও বিশ্বদর্শন দিয়ে। ফলে ইম্প্রেশনিজমের ধারায় স্থিত থাকা বিষ্ণু দে-র জন্য অনিবার্য সত্য হয়ে থাকে না।

তথাপি এ কথা বলা চলে, ইম্প্রেশনিজমে ব্যক্তিকতা ও তার স্বাধীনতার যে আবেদন রয়েছে, শিল্পীর অন্তর্দর্শনের যে বৈভবময় বিচ্ছুরণের স্বাধীনতা রয়েছে তা শেষত আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আর গ্রহণযোগ্যতার শর্তে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সামাজিক সামঞ্জস্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিষ্ণু দে এ শর্তেই উক্ত রীতির পরিচর্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। ব্যক্তিক চিন্তনকে সার্বজনীনত্বে বিভূষিত করার লক্ষ্য যেমন এখানে প্রবল, তেমনি সামাজিকতা ও নান্দনিকতার বেণীবন্ধন রচনাও তাঁর অন্বিষ্ট, ইম্প্রেশনিজম তাই তাঁর কবিতায় একটি প্রয়োগকলা মাত্র।

সহায়ক গ্রন্থনির্দেশ

১ 'রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ইউরোপীয় ইম্প্রেশনিজম', (প্রবন্ধ), ইন্দ্রাণী হালদার, দ্র. *রাতের তারা দিনের রবি*, সংকলন গ্রন্থ, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ১৩৯৫

২ 'শিল্পীর তন্ময়ধ্যানে সৌন্দর্যে গম্ভীর' : বিষ্ণু দে, (প্রবন্ধ), তারাপদ আচার্য, দ্র. *বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য*, সংকলনগ্রন্থ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯১

৩ *A History of Impressionism* . John Rewald. Seker & Warburg. London 1973

৪ *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* , দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৯৪

৫ *বিষ্ণু দে, কবিতা সংগ্রহ* ১-২ , আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৯৬ ও ১৩৯৭